Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 74–79
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

প্রমথনাথ বিশীর ছোটগল্পের অন্দরমহল : একটি হাস্যরস ভিত্তিক পর্যালোচনা

সুকান্ত মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিশ্বভারতী
ইমেল : sukanta7777mondal@gmail.com

Keyword
Personal life, Short Story, Humor, Mythology, Political Satire, Historicize.

Abstract
The question, who is the actual pioneer of Bengali humorous short stories, has immense doubts. Names arise of Rabindranath Tagore, Shibram Chakraborty, Rajsekhar Basu when the journey of short story in Bengali literature comes in front. But among them the most underrated name is Pramathanath Bisi a.k.a Pra.na.bi. and this essay takes up the task of cultivate his craftsmanship and mastery in our literature. At the same time the task of categorization of his works into three different genres—mythological, political and historical; will also be done. How modernization of mythology or depiction of reality through history or polity of our country, have been executed by him, will also be the subject matter in this essay. At the same time, comparisons of other contemporary Bengali short story writers will be drawn to point out the place, we can attribute him with.

Discussion
বাংলা হাস্যরস প্রধান ছোটগল্পের সার্থক সৃষ্টির কালানুক্রম নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধের অন্ত নেই। তবে, হাস্যরস প্রধান ছোটগল্পের ধারায় যথার্থ শিল্পীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে যাঁদের নাম উঠে আসে তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবরাম চক্রবর্তী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু প্রমুখ। পরিচিত এই সূচিপত্রের বাইরে যিনি বাংলা হাস্যরস প্রধান ছোটগল্পের ধারায় আজও অবহেলিত, তিনি প্রমথনাথ বিশী। বাংলা সাহিত্যে প্রমথনাথের পরিচয় মূলত প্রাবন্ধিক হিসেবে। বিশেষ করে তাঁর রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধগ্রন্থটি পাঠকের কাছে তাঁর পরিচয়পত্র বলা চলে। কিন্তু এই প্রবন্ধগ্রন্থের বাইরে প্রমথনাথ রচনা করেছেন অসংখ্য ছোটগল্প (সংখ্যার বিচারে শতাধিক) যেখানে উপস্থিত

হাস্যরসই গল্পগুলির প্রাণকেন্দ্র। কিন্তু বিস্তীর্ণ সৃষ্টিসম্ভারের পরও বাংলা সাহিত্যে প্রমথনাথ ব্রাত্য এক শিল্পী। বিশেষ করে বাংলা হাস্যরস প্রধান ছোটগল্পের ধারায় তাঁকে মনে রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি বাঙালি পাঠকসমাজ। আর তাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যই হলো বাংলা হাস্যরস প্রধান ছোটগল্পের ধারায় প্রমথনাথের সার্বিক শিল্পীসত্তার বিশ্লেষণ করা। প্রমথনাথের হাস্যরস প্রধান ছোটগল্পের ধারায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তিনটি শাখা হলো পুরাণ, রাজনীতি এবং ইতিহাস নির্ভর ছোটগল্পগুলি। আর তাই সীমিত পরিসরে এই প্রবন্ধে প্রমথনাথের পৌরাণিক রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক গল্পগুলির সুবিস্তৃত আলোচনার ভিত্তিতে গল্পকার প্রমথনাথের শিল্পীসত্তার সার্বিক বিশ্লেষণ এখানে করা হবে। তবে, গল্পগুলির সামগ্রিক বিশ্লেষণের পূর্বে ব্যক্তি প্রমথনাথের জীবনপর্বের কিছু তথ্য পাঠকের জানা প্রয়োজন।

বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার অন্তর্গত চলনবিল অঞ্চলের জোয়াড়ি গ্রামে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ১১ই জুন প্রমথনাথ বিশীর জন্ম। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পিতার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আসেন শিক্ষালাভ করতে। শান্তিনিকেতন আশ্রমে থাকাকালীন রবীন্দ্র সান্নিধ্য লাভের পাশাপাশি প্রমথনাথের জীবনে যেটি প্রধানভাবে দেখা দেয় তা হল তাঁর পরিহাস রসিক মন। আশ্রমচত্বরে ঘটা নানান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হাস্যরসিক প্রমথনাথের পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে বারবার। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত, পম্পা মজুমদার রচিত, জীবনীগ্রন্থ সিরিজের 'প্রমথনাথ বিশী' নামক গ্রন্থটি এবং প্রমথনাথ বিশী রচিত 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' গ্রন্থটিতে ছাত্রজীবনে ব্যক্তি প্রমথনাথের এই পরিহাস রসিক মনের চিত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ব্যাপকভাবে। এখন প্রশ্ন হলো ব্যক্তি প্রমথনাথ সম্পর্কে এই বিপুল তথ্যসম্ভারের প্রয়োজন কী! বিশেষ করে গল্পকার প্রমথনাথকে জানতে এই তথ্য কতটা যুক্তিসঙ্গত। আমরা জানি লেখকের বর্তমান সত্তার ভেতর নিহিত থাকে অতীত স্মৃতির বীজ। প্রমথনাথের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। আশ্রম পর্বে পরিহাস রসিক মন সকলের নিভৃতে প্রমথনাথকে যেভাবে গড়ে তুলেছিল তা পরবর্তীকালে তাঁর গল্প রচনায় বিশেষ প্রভাব ফেলে। আসলে শান্তিনিকেতন পর্বের দীর্ঘ সময় লেখক প্রমথনাথের কথাবয়ানে একটি বিশেষ ঘরানাকে স্থাপন করেছিল। যা পরবর্তীতে তাঁর গল্পগুলিতে অঝোর ধারায় বর্ষিত হয়েছে। আর তাই ব্যক্তি প্রমথনাথের জীবনে এই সময় পর্বটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি পরবর্তীতে শিক্ষার সুবাদে তাঁর কলকাতায় বসবাসের সময় পর্বটিও লেখক প্রমথনাথের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় বলা চলে।

প্রমথনাথের গল্পের মূল রসই হলো 'wit' এবং 'satire' ভিত্তিক। এই 'wit' এবং 'satire'কে যথার্থরূপে ব্যবহার করতে তিনি কখনও কখনও বেছে নিয়েছেন পৌরাণিক আবহকে। পৌরাণিক মিথকে সামনে রেখে ছোটগল্পের নবতর বয়ান রচনায় প্রমথনাথের জুড়ি মেলা ভার। দেবদেবীর গতানুগতিক আবহকে ভেঙে ফেলে তিনি যেভাবে গল্পের পরিসর নির্মাণ করেন তাতে করে পৌরাণিক ঘটনাগুলি যেন নতুন মাত্রা লাভ করে। এই নবনির্মিত পৌরাণিক ঘটনার নিরিখে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তাঁর রচিত 'ন-ন-লৌ-ব-লিঃ' গল্পটির কথা। জনপ্রিয় এই গল্পটি শুরু হয়েছে অপূর্ব এক বর্ণনার মধ্যে দিয়ে যথা-

> "স্বর্গের নন্দন বনে পারিজাত বৃক্ষ তলে আজ বড় ভিড়। বালক, যুবক,বৃদ্ধ সকল বয়সের দেবতা সমবেত হইয়াছে। পারিজাতের ডালে একখণ্ড কাগজে একখানা বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে। সেই বিজ্ঞাপন পরিবার জন্য এই ভীষণ দৈবজনতা।"[১]

কি এই বিজ্ঞাপন! নন্দন এবং নরকের যোগ স্থাপনের জন্য নির্মিত নন্দন নরক লৌহবর্ম লিমিটেড-এ কর্মীর জন্য তিনজন সাধু, সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী কর্মী চাই। শুধু তাই নয়, কথক বলেছেন,

> "স্বর্গের ঘর বাড়ি, রাস্তা ঘাট, প্রাচীর গাত্র বিজ্ঞাপনের নামাবলী পরিল। সম্ভব-অসম্ভব সব স্থানে বিজ্ঞাপন দেখা দিল। যেন এক রাত্রের মধ্যে স্বর্গীয় দেহ আচ্ছন্ন করিয়া চর্মরোগ দেখা দিল। ইন্দ্রের রথে, ঐরাবতের পিঠে, উচ্চৈঃশ্রবার কণ্ঠে সর্বত্র কর্মখালি বিজ্ঞাপন।"[২]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে বিজ্ঞাপন সংস্থার দাপটের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা প্রায় প্রত্যেকেই অবগত। কথক এই ইতিহাসকে প্রতিস্থাপন করেছেন স্বর্গভূমিতে। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের সর্বজয়ী দাপট থেকে আজ স্বর্গও বঞ্চিত নয়। আশ্চর্য হতে হয় যখন তিনি বলেন -

> "তবে কি স্বর্গেও বেকার সমস্যা দেখা দিল নাকি? অসম্ভব নয়! স্বর্গের সনাতন জনসংখ্যা তেত্রিশ কোটি বাড়িয়া তেতাল্লিশ কোটিতে দাঁড়ায়াছে। তারপর মন্দাকিনী তে তো বন্যা লাগিয়া আছে। বিশেষ দেবদৈত্যের সেই মহাযুদ্ধের পর হইতে স্বর্গের পরমার্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া চলিয়াছে; স্বর্গের অবস্থা আজ বড় শোচনীয়।"[৩]

কথকের এই বর্ণনায় আমাদের মধ্যে আর কোন সন্দেহই নেই। আমরা বুঝতে পারি এ তো স্বর্গ নয়, এ তো বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের চিত্র। স্বর্গের দেবতাগণ যেন বাংলাদেশেরই লক্ষ লক্ষ বেকারের প্রতিনিধি মাত্র। এখানেই প্রমথনাথের কৃতিত্ব। বিষয় নির্বাচন এবং রচনাশৈলীর নিপুণতায় তিনি যেভাবে সূক্ষ্মতার গভীরে পৌঁছান তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। শেষ পর্যন্ত এই অসংখ্য আবেদন থেকে বেছে বেছে তিনজনের দরখাস্ত গ্রহণ করা হলো। তারা যথাক্রমে বুদ্ধ, যিশু এবং যুধিষ্ঠির। গল্পটির প্রকৃত রস এখানেই নিহিত। আমরা জানি বৌদ্ধ ধর্ম, সনাতনী হিন্দু ধর্ম, এবং সুপ্রাচীন খ্রিস্ট ধর্ম মতে বুদ্ধ, যুধিষ্ঠির এবং যীশু হলেন ন্যায় ও সত্যের প্রতীক। কিন্তু গল্পের ক্রম পরিণতিতে দেখা গেল এই তিন সৎ চরিত্র ক্রমশ অসৎ চরিত্রে পরিণত হলো। তারা ঘুষ খেতে শুরু করলো, এমনকি ঘুষ ছাড়া তারা এখন আর স্বর্গ যাত্রীদের পদ ছেড়ে দেয় না। কথক বলেছেন–

> "যাদের টিকিট নাই তাহারা অনায়াসে কিছু কিছু দিয়া স্বর্গে অনধিকার প্রবেশ করিতে লাগিল... যীশু রাগিয়া বলিল আমি ঘুষ লইবো না... তবে যদি পান খাইতে কিছু দাও সে, হাঁ, সে স্বতন্ত্র কথা। ...বুদ্ধদেব স্পষ্টভাষী লোক বলিল- দেখো বাপু আমি ঘুষ খায় না, তবে ভালোমানুষি বলিয়া কিছু দিয়া থাকিলে লইয়া থাকি... যুধিষ্ঠির তাহাকে দেখিয়া বলিল- দেখো বাপু তোমাকে দেখিয়াই বুঝিতেছি টিকিট তোমার নাই, আমি ঘুষ লই না কিন্তু আমি ডালা লই। ডালা কোথায়?"[৪]

পুরাণ প্রতিষ্ঠিত তিন চরিত্রের দৈব মহিমাকে ভেঙে ফেলে তাদের সাধারণ মানুষের পরিণত করেছেন গল্পকার। তিনি দেখাতে চেয়েছেন বাঙালি জাতি এবং সংস্কৃতির প্রভাবে কীভাবে সৎ নির্ভীক চরিত্র অসৎ চরিত্রের পরিণত হয়। হাস্যদীপ্ত এই স্যাটায়ার বাংলা হাস্যরস প্রধান গল্পে খুব কমই মেলে। বিশেষ করে পুরাণ প্রতিষ্ঠিত চরিত্রদের মাটির পৃথিবীর কাছাকাছি এনে তাদের সাধারণ করে তোলার ভিতরে রয়েছে গল্পকারের অসীম সাহস। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে আরও একটি গল্পের কথা। যথা 'ব্রহ্মার হাসি'। বিশী রচিত আলোচ্য গল্পটিও পাঠক মহলে বিশেষ সমাদৃত। গল্পটির পটভূমি নির্মিত হয়েছে স্বর্গভূমিকে কেন্দ্র করে। গল্পের মূল চরিত্র ভুলুর সিনেমা অন্ত প্রাণ। সিনেমা দেখতে যাওয়ার পথেই একদিন তার মৃত্যু ঘটলে ভুলুকে আনা হয় স্বর্গে। সেখানে ব্রহ্মা এবং ভুলুর কথোপকথনের ভিতরে সিনেমাকে কেন্দ্র করে সমকালীন সমাজের বাস্তব পটভূমি চিত্রিত হয়েছে। ভুলু ব্রহ্মাকে কথোপকথনকালে বলেছে, খোঁড়া লোক যেমন লাঠি ছাড়া চলতে পারে না ঠিক তেমনভাবে আমরা অর্থাৎ বাঙালিরা জাতীয় সংগীত ছাড়া চলতে পারি না।

এই কথা বলেই সে উচ্চারণ করেছে -

> "ত্বং হি দুর্গা দশ-প্রহরণধারিণী
> কমলা কমলদলনিবাসিনী
> নমামি তারিণীং
> রিপুদলবারিণীং
> বহুবলধারিণীং মাতরং"[৫]

ব্রহ্মা ভুলুকে প্রশ্ন করেছে,

> "কে তোমাদের মা? গদগদ কণ্ঠে ভুলু বলিল- সি-নে-মা"[৬]

ভুলু বলেছে -

> "আমরা গৌড়বাসী আমাদের মারো, কাটো, অনশনে রাখো, manhole-এ নিক্ষেপ করো, আমাদের উপর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ চালাও সমস্ত দেশটাকে 'নোয়াখালি' করিয়া দাও, কিছুতেই আমাদের দুঃখ নাই- কিন্তু সিনেমায় হস্তক্ষেপ করলে আমরা সহ্য করিব না..."[৭]

বাঙালি জাতির নির্বুদ্ধিতা এবং প্রথাসর্বস্ব মননের প্রত্যক্ষ ছবি এখানে ধরা পড়েছে। সমগ্র দেশ যখন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের তীব্র সংকটে পতিত তখন একদল মানুষকে ভুলিয়ে রাখা হচ্ছিল সিনেমার মধুময় দৃশ্যসজ্জায়। বাঙালির চিরঘুমের প্রচেষ্টাকে

ভেঙে ফেলে তাই গল্পকার এখানে প্রকাশ করতে চেয়েছেন সেই সত্যকে যা বাস্তবতার রঙে রঙিন। সমালোচক Evan Gottlieb একদা Satire প্রসঙ্গে বলেছিলেন -

> "Satire is the art of making someone or something look ridiculous, raising laughter in order to embarrass, humble, or discredit its targets"[৮]

উপরিউক্ত গল্প প্রসঙ্গে সমালোচকদের এই বক্তব্য মিলিয়ে নিতে আমাদের অসুবিধা হয়না।

পৌরাণিক গল্পের পর এবার আসা যেতে পারে প্রমথনাথ বিশীর রাজনৈতিক গল্প প্রসঙ্গে। যদিও প্রমথনাথ তাঁর গল্পে পুরাণ এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে একাকার করে দিয়েছেন। আর তাই পৌরাণিক গল্পগুলির গভীরে ধরা পড়েছে রাজনৈতিক নানান প্রসঙ্গ। তবে পৌরাণিক আবহের বাইরেও বিশুদ্ধ রাজনীতির উত্থান পতনের গল্পও বিশী কম রচনা করেননি। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে- 'যন্ত্রের বিদ্রোহ' গল্পটি। আলোচ্য গল্পটির মাধ্যমে গল্পকার স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক পালাবদলের চিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন অপূর্ব ভঙ্গিমায়। বিশেষ করে স্বাধীনতা পরবর্তীতে সৃষ্ট হওয়া নব্য রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা এবং তাদের ভাঙন নীতিকে গল্পকার মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেননি যথাযথভাবে। আর তাই তাদের প্রতি সমালোচকের দৃষ্টিতেই আলোচ্য গল্পটির রচনা। তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে প্রমথনাথ ছিলেন গান্ধী পরিচালিত কংগ্রেসের আদর্শে আদর্শায়িত। তাই মার্কসীয় ভাবনার নতুনত্ব তাঁর কাছে বিশেষ ভালো ঠেকেনি। তবে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের বাইরে প্রমথনাথ যেহেতু দীর্ঘদিন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন তাই রাজনৈতিক নেতাদের কপটতাকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন যথার্থভাবে। আর তাই সেই ভন্ড মুখোশ খুলে ফেলার সূত্রেও এই পর্বের গল্পগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য গল্পটি শুরু হয়েছে একটি বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে। সেই বিদ্রোহ মানুষের বিরুদ্ধে যন্ত্রের। কোন একদিন সমস্ত যন্ত্রের মনে হয়েছে মনুষ্যসমাজ তাদের ঠকিয়ে, বিনা পারিশ্রমিকে শ্রম করিয়ে নিচ্ছে। তাই এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রয়োজন। ধীরে ধীরে সমস্ত শহরের যন্ত্ররা এক হয়ে এল শুধুমাত্র গরুর গাড়ি বাদে। এবিষয়ে গরুর গাড়ির বক্তব্য -

> "বন্ধুরা আপনারা বড় বড় কল, আর আমি নেহাত পুরাতন, সেকেলে গরুর গাড়ি- নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। আজ দরকারের সময় আপনারা আমাকে আত্মীয় বলিয়া কাছে ডাকিতেছেন, কিন্তু এ পর্যন্ত আপনারা আমাকে ঘৃণা করিয়া আসিয়াছেন- কলের সমাজে এতদিন আমি ছিলাম হরিজন।"[৯]

সমাজ জীবনে এই দৃশ্য তো আমাদের অতি পরিচিত। ভোটকেন্দ্রিক রাজনীতির যুগে সাধারণ মানুষ শুধুমাত্র প্রয়োজনের সংখ্যাতত্ত্ব মাত্র ।কাজ মিটে গেলেই তাদের ফেলে দেওয়া হয় ছুঁড়ে। আর তাই গরুর গাড়ির কণ্ঠে সেই বঞ্চনার বেদনা ফুটে উঠেছে। গরুর গাড়ির প্রশ্নের উত্তরে সকলে বলে উঠেছে -

> "গরুর গাড়ি তুমি কুলাধম, বিশ্বাসঘাতক, পরাধীন, তুমি সেকেলে, তুমি বুর্জোয়া।"[১০]

মতের মিল না ঘটায় বিরোধী পক্ষকে যেভাবে অন্যপক্ষ চিহ্নিত করে এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আসলে যন্ত্রের রূপকে এ যেন মানুষের কথা। সেইসব মানুষের, যারা চিরকাল থেকে গেছে নিভৃতে; গোপনে।

এ প্রসঙ্গে অপর একটি গল্পের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। গল্পটির নাম 'সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী'। আলোচ্য গল্পে সিন্দবাদের সঙ্গে মেষ রাজ্যের মানুষদের কথোপকথনকে গল্পকার তুলে ধরেছেন অপূর্ব ভঙ্গিমায়। এই কথোপকথন যে কল্পনাপ্রসূত তা পাঠক মাত্রই বুঝতে পারবে। কিন্তু এই কল্পনার ভিতরে যে সত্য লুক্কায়িত রয়েছে তা গল্পকার প্রমথনাথকে জানার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে কয়েকটি কথোপকথনের ভিত্তিতে গল্পটির সমালোচনা করা যেতে পারে। মেষ রাজ্যের একজন মনুষ্যজাতি সম্বন্ধে সিন্ধবাদকে প্রশ্ন করেছে -

> "শুনিয়াছি তাহারা সকলেই সমান, ইহা কীরূপে সম্ভব?"[১১]

সিন্দবাদ বলেছে,

> "কেন সম্ভব নয়? মানুষের মধ্যে কেহ বা গাড়িতে চাপে আর কেহ বা সেই গাড়ি চাপা পড়িয়া মরে। অসাম্য কোথায়?
>
> প্রশ্ন -মৈত্রী কাহাকে বলে?
>
> উত্তর- ধনীর বিলাসের জন্য দরিদ্রের খাজনা দিবার অধিকারের নাম মৈত্রী।

প্রশ্ন -রাজনীতি কী?

উত্তর- রাত্রে ক্ষুধা উদ্রেক করিবার জন্য বাকব্যায়াম। এই জন্যই অধিকাংশ রাজনৈতিক সভা সন্ধ্যাবেলা আহূত হয়।"[১২]

উপরিউক্ত প্রশ্ন উত্তরের ভিত্তিতে আসলে গল্পকার সমকালীন ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ ছবিকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদের ভীতকে ধ্বসিয়ে দিতে লেখকের এই বাস্তবতার উপস্থাপন।

রাজনৈতিক এই পরিধির বাইরে রয়েছে আর এক শ্রেণীর গল্প সেখানেও প্রমথনাথের নিজস্বতা চোখে পড়ার মতো। ইতিহাসভিত্তিক এইসব গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলা চলে। কেননা ইতিহাসের বাস্তবতা ও লেখকের কল্পনাশক্তি মিলেমিশে এই প্রকৃতির গল্পগুলির ভিতর যেভাবে 'wit' ও 'satire' সৃষ্টি হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত দুর্লভ। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'সেকেন্দার শা-র প্রত্যাবর্তন' গল্পটি। এটি একটি ঐতিহাসিক ব্যঙ্গ গল্প। দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার শা পাঞ্জাব বিজয়ের পরও কেন ভারত ত্যাগ করলেন, এটি ইতিহাসের একটি অমীমাংসিত সমস্যা। পণ্ডিতেরা নানান অনুমানের সাপেক্ষে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হলেও তাতে রসের বড় অভাব। আর তাই ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গীমায় প্রমথনাথ 'সেকেন্দার শা-র প্রত্যাবর্তন' গল্পে জুড়ে দিয়েছেন কিছু কল্পনাপ্রসূত কারণ। ইতিহাসের বিচারে তা সমাদৃত না হলেও সাহিত্যের বিচারে বিশেষ রূপে সমাদৃত। সেকেন্দার শা-র অনুগামী একজন গ্রিক সৈনিক পেস্কাডস এরিওফিস এর ডায়েরিকে সম্বল করে লেখক জানিয়েছেন, একজন গৌড়ীয় বন্দী বিদেশীর পাল্লায় পড়ে গ্রিক সুন্দরী হেলেন সেকেন্দার শা-কে ছেড়ে পলায়ন করেন। এমত অবস্থায় সেকেন্দার শা-র ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত না নিয়ে আর কি উপায় থাকতে পারে! হেলেন সেকেন্দার শা-কে চিঠিতে জানিয়েছেন -

"সম্রাট,

কৌশলে বন্দীকে উদ্ধার করে নিয়ে পাটরানী হবার আশায় দুজনে প্রস্থান করলাম। আমার সন্ধান করবেন না, করলেও পাবেন না, পেলেও আমি আর ফিরবো না, কারণ বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।

সম্রাট, অনেকদিন আপনার কাছে ছিলাম, অনেক দয়া, অনেক অর্থ পেয়েছি। বিদায় কালে আপনার মঙ্গল কামনায় একটি মিনতি জানিয়ে যাই, সুরাপানের পরিমাণ কমিয়ে দেবেন। এটি আপনার প্রধান দোষ। আমার মাথা খান অনুরোধটি রাখবেন।

ইতি –
গৌড়োভিমুখীনী
হেলেন।"[১৩]

ইতিহাসের তথ্য নির্ভর বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার রস মিশিয়ে গল্পের এই পরিধি নির্মাণের ভিতর বিশীর মুন্সিয়ানার যে পরিচয় মেলে তা বাংলা সাহিত্যের সত্যিই দুর্লভ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে 'সে সন্ন্যাসীর কি হইলো' গল্পটির কথা। আলোচ্য গল্পটির নির্মাণেও ব্যঙ্গ রসের তীব্রতা লক্ষণীয়। বুদ্ধের সন্ন্যাস গ্রহণ নিয়ে এ যাবৎ যা কিছু তথ্য উঠে এসেছে প্রমথনাথ তাকে এক লহমায় ভেঙে ফেলে নির্মাণ করেছেন নবতর তথ্য। যদিও এই তথ্য সত্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। কিন্তু গল্পকার সৃজিত এই নবতর তথ্য হাস্যরসে ভরা। বিশেষ করে যে সন্ন্যাসীকে দেখে বুদ্ধ ঘর ছেড়েছিলেন সেই সন্ন্যাসীর দ্বাদশ উপপত্নীকে নিয়ে যখন বুদ্ধ যাত্রা করেছেন তখন পাঠক আর স্থির থাকতে পারেনি। কেননা বুদ্ধের পরবর্তী সন্ন্যাসকে কল্পনা করে পাঠকের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছে হাস্যরসের ফল্গুধারা। কেননা যে ভুলের কারণে সন্ন্যাসীটি সংসারী হয়েছিল বুদ্ধ ও সেই একই ভুলের শিকার হলেন। অর্থাৎ বুদ্ধের দেওয়া শাস্তির ফাঁদে এখন বুদ্ধ স্বয়ং পতিত। এছাড়াও নানাসাহেবকে কেন্দ্র করে রচিত হওয়া মিথকে অবলম্বন করে নির্মিত 'নানাসাহেব' গল্পটিও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। নানা সাহেবের বর্ণনা প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষ ভিন্ন ভিন্ন রূপে নানার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা যেমন উপভোগ্য তেমনি হাস্যকর। এছাড়াও 'চাচাতুয়া', 'সাবানের টুকরো', 'কলাচর্চা' ইত্যাদি গল্পগুলি এক্ষেত্রে স্মরণীয়।

অবশেষে বলতে হয় বাংলা হাস্যরস নির্ভর ছোটগল্পের ধারায় প্রমথনাথ বিশী আসলে সেই ব্যক্তিত্ব যিনি নিছক কৌতুক রসের সঞ্চার ঘটাতে তাঁর হাস্যরসপ্রধান ছোটগল্পগুলি নির্মাণ করেননি। সমাজ অসঙ্গতির দিককে যথার্থরূপে পরিস্ফুট করে তোলায় তাঁর লেখক মনের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করে তুলতে তিনি কখনো বেছে নিয়েছেন

পৌরাণিক অনুষঙ্গ, কখনো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আবার কখনো বা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। তাঁর হাতে পুরাণ রাজনীতি এবং ইতিহাসের প্রথাগত সত্য অবলুপ্ত হয়ে প্রকট হয়ে উঠেছে নবনির্মিত এক সত্য। যে সত্য বাস্তবতার রঙে রঙিন। তবে তার মোড়ক ব্যঙ্গের। প্রমথনাথের গল্পে লেখকের সত্যবাদী মন প্রসঙ্গে সমালোচকের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় -

> "প্রমথনাথের ছোটগল্প যেন এক চরিত্রশালা। বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি তাঁর সাহিত্যের পাতায় জীবন্ত ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে... আমরা পঙ্ককে চাযইনা, চাই পঙ্কজকে, চাই সুন্দরকে। তবুও পঙ্কজের কথা বলতে গিয়ে পঙ্কের কথা বা অসুন্দরের কথা স্বাভাবিকভাবেই এসে যায়। পরস্পর বিরোধী এই দুই চরিত্র প্রমথনাথ তাঁর ছোটগল্পে আমদানি করে আমাদের বলতে চেয়েছেন যে সাহিত্যের মধ্যে থেকেই জীবনের প্রশস্ত রাজপথ নির্মিত হয়। সে রাজপথ সত্য ও সুন্দরের রাজপথ।"[১৪]

তবে এই যথার্থ সৃষ্টিশীলতার পরও প্রমথনাথ বিশী বাংলা হাস্যরস প্রধান ছোটগল্পের ধারায় যথার্থরূপে প্রতিষ্টিত নন।এর কারণ কী তা আলোচনা সাপেক্ষ। আপাতত তাঁর কৃতিত্ব কে সম্মান জানিয়ে বলতে পারি বাংলা ছোটগল্পের ধারায় প্রমথনাথ সেই শিল্পী যাঁর জাদুস্পর্শে বাংলা হাস্যরস প্রধান ছোটগল্প এক বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে। সেই সঙ্গে তাঁর বিপুল সৃষ্টিসম্ভার বাংলা সাহিত্যকে প্রদান করেছে অমৃত সম্পদ। আর তাই বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছে চিরঋণী।

তথ্যসূত্র :

১. বিশী.প্রমথনাথ, 'ন ন লৌ ব লিঃ', গল্পসমগ্র-১, কলকাতা-৭৩, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৯, পৃ. ৭
২. তদেব, পৃ-৮
৩. তদেব, পৃ-৭
৪. তদেব, পৃ-১৩, ১৪
৫. বিশী.প্রমথনাথ, 'ব্রহ্মার হাসি', গল্পসমগ্র-২, কলকাতা-৭৩, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪১০, পৃ. ২৮
৬. তদেব, পৃ. ২৮
৭. তদেব, পৃ. ২৮
৮. চট্টোপাধ্যায়.কুন্তল, সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, কলকাতা-০৯, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৪০২, পৃ. ১২৩
৯. বিশী.প্রমথনাথ, 'যন্ত্রের বিদ্রোহ', গল্পসমগ্র-১, কলকাতা-৭৩, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৯, পৃ. ২১,২২
১০. তদেব, পৃ-২২
১১. বিশী.প্রমথনাথ, 'সিন্ধবাদের অষ্টম সমুদ্র যাত্রার কাহিনী', গল্পসমগ্র-১, কলকাতা-৭৩, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৯, পৃ-৪৭
১২. তদেব, পৃ-৪৭,৪৮
১৩. বিশী.প্রমথনাথ, 'সেকেন্দার শা-র প্রত্যাবর্তন', নীলবর্ণ শৃগাল, কলকাতা-৬, শ্রী গুরু লাইব্রেরি, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৬৩, পৃ. ৪৯
১৪. চক্রবর্তী.সতী, ছোটগল্পের অঙ্গন প্রমথনাথ বিশী, কলকাতা-১২, অর্পিতা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০০, পৃ. ২১